بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১১ জানুয়ারি ২০১৯ মোতাবেক ১১ সুলাহ্ ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত খাল্লাদ বিন আমর বিন জামুহ্ (রা.) একজন আনসারী সাহাবী ছিলেন এবং বদরী সাহাবীদের একজন ছিলেন। তিনি তার পিতা হযরত আমর বিন জামুহ্, তার ভাই হযরত মুয়ায (রা.), হযরত আবু আয়মান (রা.) এবং মুআওয়েয (রা.)'র সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত আবু আয়মান (রা.) সম্পর্কে এটিও বলা হয় যে, তিনি তার ভাই ছিলেন না বরং তার পিতা হযরত আমর বিন জামুহ্ (রা.)'র মুক্ত ক্রীতদাস ছিলেন। **(উসদুল গাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৮৪, খাল্লাদ বিন আমর, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সনে মুদ্রিত)**

বদরের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রার সময় মহানবী (সা.) তাঁর সৈন্যদলের সাথে মদীনার বাইরে **'সুকিয়া'**র কাছে এক জায়গায় অবস্থান করেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন কাতাদাহ্ তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, মদীনার বাইরে একটি জায়গা **'সুকিয়া'** যেখানে একটি কূপও ছিল এর নিকটে মহানবী (সা.) নামায আদায় করেন, আর মদীনাবাসীর জন্য দোয়া করেন। হযরত আদী ইবনে আবি আয্যাগবা আর বাস্বাস্ বিন আমর এখানে অবস্থানকালেই মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন, কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন হারামও মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনার এখানে অবস্থান এবং সাহাবীদের অবস্থা যাচাই করা ভালো কাজ আর আমরা এটিকে শুভ লক্ষণ মনে করি, কেননা আমাদের অর্থাৎ বনু সালামাহ্ এবং হুসাইকাবাসীদের মাঝে যখন যুদ্ধ হয় তখন আমরা এখানেই শিবির স্থাপন করেছিলাম। (তিনি) প্রাক ইসলামী যুগের পুরোনো কথা বর্ণনা করছেন। মদীনার নিকটে যুবাব নামক একটি পাহাড় রয়েছে, এই পাহাড়ের পাশেই হুসাইকা নামের একটি জায়গা ছিল যেখানে ইহুদীদের একটি বড় জনবসতি ছিল। তিনি বলেন, আমরাও এখানেই আমাদের সাথীদের উপস্থিতি এবং সংখ্যা খতিয়ে দেখেছিলাম আর যারা যুদ্ধ করার শক্তি রাখতো তাদেরকে (যুদ্ধ করার) অনুমতি দিয়েছিলাম আর যারা অস্ত্র-চালনার শক্তি রাখতো না তাদের ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এরপর আমরা হুসাইকার ইহুদীদের অভিমুখে অগ্রাভিযান পরিচালনা করেছিলাম। তখন ইহুদীদের মাঝে হুসাইকার ইহুদীরাই সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল। আমরা তাদেরকে যেভাবে চেয়েছি হত্যা করেছি, অর্থাৎ, তাদের উভয় পক্ষের মাঝে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছিল। তাই তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি আশা করি আমরা যখন কুরাইশের মুখোমুখি হব তখন আল্লাহ্ তা'লা তাদের মাধ্যমে আপনাকে নয়নের স্নিগ্ধতা দান করবেন অর্থাৎ আপনিও বিজয় লাভ করবেন যেভাবে অতীতে আমরা বিজয় লাভ করেছিলাম।

হযরত খাল্লাদ বিন আমর (রা.) বলেন, যখন সূর্য উদিত হয় তখন আমি 'খুরবা'য় আমার পরিবার পরিজনের কাছে যাই, 'খুরবা' সেই পাড়ার নাম যেখানে সালামাহ্ গোত্রের বসতি ছিল। তিনি বলেন, আমার পিতা আমর বিন জামূহ্ (রা.) বলেন, আমার মনে হয়েছিল, তুমি চলে গেছ। পূর্বে যে রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে তাতে এটি লেখা ছিল, পিতা আমর বিন জামূহ্-র সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু এই রেওয়ায়েত এবং পরবর্তী

অন্যান্য রেওয়ায়েত থেকেও এটিই জানা যায়, (তার) পিতা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি। আমি তাকে বললাম, মহানবী (সা.) **সুকিয়া**'র ময়দানে যোদ্ধাদের পর্যবেক্ষণ করছেন ও সংখ্যা গণনা করাচ্ছেন। তখন হযরত আমর (রা.) বলেন, কতইনা শুভ লক্ষণ এটি! খোদার কসম! আমি আশা করি তোমরা মালে গণিমত লাভ করবে আর মক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে। যেদিন আমরা হুসাইকা অভিমুখে অগ্রযাত্রা করেছিলাম সেদিন আমরাও এখানেই শিবির স্থাপন করেছিলাম। পূর্বের রেওয়ায়েতে তাদের এবং ইহুদীদের মাঝে সংঘটিত যুদ্ধের যে বিবরণ রয়েছে সে কথার তিনিও সত্যায়ন করছেন।

হযরত খাল্লাদ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) **হুসাইকাহ্**'র নাম পরিবর্তন করে **সুকিয়া** রাখেন। আমার হৃদয়ে **সুকিয়া** অর্থাৎ এই জায়গাটি ক্রয় করার বাসনা ছিল। কিন্তু আমার পূর্বেই হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) দু'টো উটের বিনিময়ে তা ক্রয় করে নেন, আর কারো কারো মতে সাত আউকিয়াহ্ অর্থাৎ দু'শ আশি দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করেছিলেন। মহানবী (সা.)-এর কাছে যখন একথা উত্থাপন করা হয় তখন তিনি বলেন, **রাবেহাল্ বায়উ'**। অর্থাৎ, এই ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক হয়েছে। (কিতাবুল মাগাযী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৭-৩৮, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ হতে ২০১৩ সনে মুদ্রিত), (মু'জেমুল বুলদান, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫৮, সুকিয়া, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ হতে মুদ্রিত), (ওয়াফাউল ওয়াফা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১২০০, খুরবা, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ হতে ১৯৮৪ সনে মুদ্রিত), (লুগাতুল হাদীস, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮২ আউকিয়াহ্, ২০০৫ সনে লাহোরের আলি আসেফ ছাপাখানা হতে মুদ্রিত)

হযরত খাল্লাদ (রা.)'র পিতা হযরত আমর ইবনে জামুহ্ (রা.) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি। খাল্লাদ এবং তার পিতা হযরত আমর ইবনে জামুহ্ এবং আবু আয়মন এই তিনজন ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং এই তিনজই শাহাদতের অমিয় সূধা পান করেন। (মুসতাদরিক আলাস্ সহীহাইন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২২৬, কিতাবু মা'রিফাতিস্ সাহাবাহ্, বাবু যিকরি মানাকিবি আমর ইবনে আল্ জামুহ্, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ হতে ২০০২ সনে মুদ্রিত) অর্থাৎ তিনি স্বয়ং, তার ভাই এবং পিতা উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার পিতা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি। তার অংশগ্রহণের বাসনা ছিল কিন্তু তার পায়ের অপারগতার কারণে, অর্থাৎ তার এক পা খোঁড়া ছিল, সুস্থ ছিলেন না, অক্ষম ছিলেন, তাই তার ছেলেরা তাকে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে দেয় নি।

হযরত খাল্লাদ (রা.)'র পিতা হযরত আমর বিন জামুহ্ (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, বদরের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.) জিহাদে যোগদানের আহ্বান জানান, আমর (রা.)'র পায়ে সমস্যা থাকার কারণে তার ছেলেরা তাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধা দেয়। আর আল্লাহ্ তা'লাও প্রতিবন্ধীদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অবকাশ দিয়েছেন। এ কারণে ছেলেরাও তাকে বাধা দিয়ে বলেছিলেন, আমরা চার ভাই যুদ্ধে যাচ্ছি তাই আপনার যাওয়ার প্রয়োজন কী, পরন্তু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেও আপনার জন্য অবকাশ রয়েছে? কাজেই আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও ছেলেদের বলার কারণে তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি। কিন্তু উহুদের যুদ্ধের সময় আমর (রা.) তার ছেলেদের বলেন, তোমরা আমাকে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে দাও নি। এখন উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ এসেছে, এবার আমাকে বাধা দিতে পারবে না, আমি অবশ্যই যাব আর উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব। (যাহোক, তিনি বলেন, এবার তোমরা আমাকে আটকাতে পারবে না; আমি অবশ্যই এতে যোগদান করবো।) সন্তানরা পুনরায় তাকে তার অক্ষমতার কারণে বাধা দিতে চাইলে তিনি স্বয়ং মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন এই ভেবে যে, মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে আমি স্বয়ং অনুমতি নিয়ে নিব।

অতএব, তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, আমার ছেলেরা এবারও আমাকে জিহাদ থেকে বিরত রাখতে চায়। পূর্বে বদর থেকে বিরত রেখেছিল, আর এখন উহুদেও অংশগ্রহণ করতে দিচ্ছে না। আমি এই জিহাদে আপনার সাথে অংশগ্রহণ করতে চাই। পুনরায় তিনি বলেন, খোদার কসম! আমি আশা রাখি আল্লাহ্ আমার আন্তরিক বাসনা গ্রহণ করবেন এবং আমাকে শাহাদতের মর্যাদা দান করবেন, আর আমার এই খোঁড়া পা নিয়েই আমি জান্নাতে প্রবেশ করব।

মহানবী (সা.) বলেন, হে আমর! খোদার সন্নিধানে আপনার পঙ্গুত্ব মূল্য রাখে আর জিহাদ আপনার জন্য অপরিহার্য নয়। কিন্তু একইসাথে মহানবী (সা.) তার ছেলেদেরও বলেন, তোমরা নেক কাজে তাকে বাধা দিও না। এটিই যদি তার মনোবাসনা হয়ে থাকে তাহলে তাকে তা পূর্ণ করতে দাও। হয়ত আল্লাহ্ তা'লা তাকে শাহাদতের মর্যাদা দান করবেন। অতঃপর হযরত আমর (রা.) স্বীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এই দোয়া করতে করতে উহুদ প্রান্তর অভিমুখে যাত্রা করেন, اللهم ارزقني الشهادةولا تردني الى أهلي خائبا **(উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মার যুকনী শাহাদাতান ওয়া লা তারুদ্দানী ইলা আহলী খায়েবান')**। অর্থাৎ, হে আল্লাহ্ আমাকে শাহাদতের মর্যাদা দিও, আর আমার গৃহপানে আমাকে ব্যর্থ ও বিফল মনোরথ ফিরিয়ে এনো না। আল্লাহ্ তা'লা তা'র দোয়া গ্রহণ করেছেন আর তিনি সেখানে শাহাদতের অমিয় সূধা পান বরণ করেন। (উসদুল গাবাহ্, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৯৫-১৯৬, খাল্লাদ বিন আমর (রা.), বৈরুতের দারুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সনে মুদ্রিত)

হযরত খাল্লাদ (রা.)'র মা হযরত হিন্দ বিনতে আমর (তার পিতার নামও আমর ছিল আর স্বামীর নামও) হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.)'র ফুপু ছিলেন। উহুদের যুদ্ধে হযরত হিন্দ (রা.) তার স্বামী, পুত্র এবং ভাইকে শাহাদতের পর উটের পিঠে তুলেন। এরপর যখন তাদের সম্পর্কে নির্দেশ আসে তখন তাদেরকে উহুদ (প্রান্তরে) ফিরিয়ে নেয়া হয় আর উহুদের (ময়দানে)ই দাফন করা হয়। (ইসাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৮৭, বৈরুতের দারুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৫ সনে মুদ্রিত)

তিনি যখন জানতে পারেন, তারা শহীদ হয়েছেন, তখন তাদের তিনজনকে মদীনায় নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিলেন, কিন্তু পরে তাদের (উহুদ প্রান্তরে) ফেরত নিয়ে যান আর এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণও পরে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় ছিল, উহুদের শহীদরা যেন উহুদ (প্রান্তরেই) সমাহিত হন। এই ঘটনার বিশদ বিবরণ এভাবে পাওয়া যায় যে, হযরত আয়েশা (রা.) উহুদের যুদ্ধের সংবাদ নেয়ার জন্য মদীনার মহিলাদের সাথে বাড়ি থেকে বাইরে বের হন। তখনও পর্দার নির্দেশ অবতীর্ণ হয় নি। যখন তিনি (রা.) হাররা নামক স্থানে পৌঁছেন তখন হিন্দ বিনতে আমর (রা.)'র সাথে তার সাক্ষাৎ হয়, যিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.)'র বোন ছিলেন। হযরত হিন্দ তার উটকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই উটে তার স্বামী হযরত আমর বিন জামূহ্, পুত্র খাল্লাদ বিন আমর, আর ভাই আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.)'র লাশ ছিল। হযরত আয়েশা (রা.) জিজ্ঞেস করেন, তুমি মানুষকে কোন অবস্থায় পিছনে রেখে এসেছ তা কি তুমি জান? হযরত আয়েশা (রা.) রণক্ষেত্রের খবর জানার চেষ্টা করছিলেন। তখন হযরত হিন্দ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) নিরাপদে আছেন, আর তিনি (সা.) নিরাপদ থাকলে বাকি সব সমস্যা তুচ্ছ। তিনি (সা.) যেহেতু ভালো আছেন তাই আর কোন সমস্যা নেই। সব সমস্যা থেকে উত্তরণ সহজ। তিনি যেহেতু নিরাপদ আছেন তাই চিন্তার কোন কারণ নেই। এরপর হযরত হিন্দ (রা.) এই আয়াত পাঠ করেন, وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا (সূরা

আল্ আহযাবঃ ২৬) অর্থাৎ, যারা অস্বীকার করেছে আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের ক্রোধসহ এমনভাবে ফিরিয়ে দিয়েছেন যে, তারা কোন কল্যাণ লাভ করতে পারে নি। আর যুদ্ধে আল্লাহ্ই মু'মিনদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ্ পরম শক্তিশালী এবং প্রবল পরাক্রমশালী।

হযরত আয়েশা (রা.) জিজ্ঞেস করেন, এই উটের ওপর কার কার (লাশ) রয়েছে। হযরত হিন্দ (রা.) বলেন, আমার ভাই, আমার পুত্র খাল্লাদ এবং আমার স্বামী আমর বিন জামুহ্ (রা.) রয়েছেন। হযরত আয়েশা (রা.) জিজ্ঞেস করেন, তুমি তাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? তিনি বলেন, আমি তাদেরকে সমাহিত করার উদ্দেশ্যে মদীনায় নিয়ে যাচ্ছি। এরপর তিনি পুনরায় তার উটকে হাঁকাতে আরম্ভ করলে উট সেখানেই মাটিতে বসে পড়ে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এর পিঠে ওজন অনেক বেশি। হযরত হিন্দ বলেন, এটি তো দু'টি উটের সমান বোঝা বহন করতে পারে। কিন্তু এখন এটি সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করছে। তিনি পুনরায় উটকে উঠানোর চেষ্টা করলে উট দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু তিনি যখন উটকে মদীনা অভিমুখী করেন তখন উট পুনরায় বসে পড়ে। এরপর উটকে যখন উহুদ অভিমুখী করেন তখন উট দ্রুত হাঁটতে থাকে। অতঃপর হযরত হিন্দ মহানবী (সা.)-এর সন্নিধানে আসেন এবং তাঁকে এই ঘটনার সংবাদ প্রদান করেন। তিনি (সা.) বলেন, এই উট আদিষ্ট হয়েছে, অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে একে এ কাজেই নিয়োজিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, এটি যেন মদীনার দিকে না গিয়ে উহুদের দিকেই যায়। মহানবী (সা.) বলেন, যুদ্ধে যাওয়ার প্রাক্কালে তোমার স্বামী কিছু বলেছিলেন কি? তিনি বলেন, আমর (রা.) যখন উহুদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি কিবলামুখী হয়ে বলেছিলেন, **'হে আল্লাহ্! আমাকে আমার পরিবার-পরিজনের কাছে লজ্জিত অবস্থায় ফিরিয়ে এনো না আর আমাকে শাহাদতের মর্যাদা দিও'**। তখন মহানবী (সা.) বলেন, এ কারণেই উট হাঁটছিল না। তিনি (সা.) বলেন, **হে আনসারগণ! তোমাদের মাঝে এমন কতক সৎকর্মশীল মানুষও রয়েছেন, তারা খোদার নামে কসম খেয়ে কোন কথা বললে আল্লাহ্ তা'লা তাদের সেই কথা অবশ্যই পূর্ণ করেন। আমর বিন জামূহ্ও তাদের একজন**। অতঃপর তিনি হযরত আমর বিন জামুহ্ (রা.)'র স্ত্রীকে বলেন, হে হিন্দ! যে সময় তোমার ভাই শহীদ হয়েছে, তখন থেকে ফিরিশ্তা তার ওপর ছায়া দিয়ে রেখেছে আর তাকে কোথায় সমাহিত করা হয় সেই অপেক্ষায় রয়েছে। শহীদদের সমাহিত করা পর্যন্ত মহানবী (সা.) সেখানেই অবস্থান করেন। এরপর বলেন, হে হিন্দ! আমর বিন জামূহ্, তোমার পুত্র খাল্লাদ আর তোমার ভাই আব্দুল্লাহ্ জান্নাতে পরস্পরের মিত্র। তখন হিন্দ নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমার জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাকেও তাদের সাহচর্য দান করেন। (কিতাবুল মাগাযী, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৩২-২৩৩, গাযওয়া উহুদ, বৈরুতের দারুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০১৩ সনে মুদ্রিত)

দ্বিতীয় সাহাবী যার স্মৃতিচারণ হবে, তিনি হলেন হযরত উকবা বিন আমের (রা.)। তার মায়ের নাম হল ফুকায়হা বিনতে সাকন, আর পিতা ছিলেন আমের বিন নাবী। তার মা'ও মহানবী (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁর হাতে বয়আত করার সম্মান লাভ করেন। হযরত উকবা বিন আমের (রা.) সেই ছয়জন আনসারী (সাহাবী)'র অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা সর্বপ্রথম মক্কায় ঈমান আনেন আর পরবর্তীতে তিনি আকাবার প্রথম বয়আতেও অংশগ্রহণ করেন। {আত্ তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪২৮, উকবা বিন আমের (রা.), বৈরুতের দারুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সনে মুদ্রিত}, {আত্ তাবকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩০১, ফুকায়হা বিনতে আল্সাকান (রা.), বৈরুতের দারুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সনে মুদ্রিত}

সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এর কিছুটা বিশদ বিবরণ লিখেছেন। মহানবী (সা.)-এর চেষ্টার ফলে মদীনায় কীভাবে ইসলামের বাণী পৌঁছেছিল। তিনি (রা.) বলেন, এরপর মহানবী (সা.) রীতি অনুসারে মক্কায় সম্মানিত মাসগুলোতে বিভিন্ন গোত্র পরিদর্শন করছিলেন তখন তিনি (সা.) জানতে পারেন, মদীনার এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি সুয়ায়েদ বিন সামেত মক্কায় এসেছে। মদীনার একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিল সুয়ায়েদ আর স্বীয় বীরত্ব, বংশ ও অন্যান্য গুণাবলীর কারণে সে 'কামেল' আখ্যায়িত হতো এবং কবিও ছিল। মহানবী (সা.) তার ঠিকানা সংগ্রহ করে তার অবস্থানস্থলে পৌঁছেন এবং তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। সে বলে, আমার কাছেও একটি বিশেষ বাণী আছে যার নাম হল 'লুকমানের মুজাল্লা'। মহানবী (সা.) বলেন, যে বাণী তোমার কাছে আছে আমাকেও তা থেকে কিছুটা শোনাও। তখন সুয়ায়েদ সেই গ্রন্থের একটি অংশ তাঁকে (সা.) শোনায়। যতটুকু মহানবী (সা.)-কে শোনানো হয়েছিল তিনি (সা.) এর প্রশংসা করে বলেন, এতে ভালো ভালো কথা আছে। কিন্তু তিনি (সা.) বলেন, আমার কাছে যে বাণী রয়েছে তা অতীব মহান এবং উন্নত আর অনেক উঁচু মানের। এরপর তিনি (সা.) তাকে পবিত্র কুরআনের একটি অংশ শোনান। তিনি (সা.) (পড়া) শেষ করলে সে বলে, হ্যাঁ, সত্যিই এটি অতি উত্তম বাণী। যদিও সে মুসলমান হয় নি কিন্তু মোটের ওপর সে তাঁর (সা.) সত্যায়ন করে এবং তাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করে নি। কিন্তু পরিতাপ! মদীনায় ফিরে গিয়ে সে খুব একটা সময় পায় নি। শীঘ্রই কোন সংঘর্ষে সে প্রাণ হারায়। এটি **বুআস** এর যুদ্ধের পূর্বেকার কথা।

এরপর এর নিকটবর্তী কোন সময়ে অর্থাৎ, **বুআস** এর যুদ্ধের পূর্বে মহানবী (সা.) আরেকবার হজ্জের মৌসুমে বিভিন্ন গোত্র পরিদর্শন করছিলেন। দৈবক্রমে তাঁর (সা.) দৃষ্টি কয়েকজন অপরিচিত লোকের ওপর পড়ে। তারা অওস গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতো। আর তাদের প্রতিমা পূজারি প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থাৎ খাযরাজের বিরুদ্ধে কুরাইশদের কাছে সাহায্য চাইতে এসেছিল। এটিও বুআসের যুদ্ধের পূর্বেকার ঘটনা আর এই সাহায্য যাচনাও সেই যুদ্ধের প্রস্তুতিরই একটি অংশ ছিল। মহানবী (সা.) তাদের কাছে যান এবং ইসলামের দাওয়াত দেন। মহানবী (সা.)-এর বক্তৃতা শুনে আইয়াস নামের এক যুবক অবলীলায় বলে উঠে, খোদার কসম! যে দিকে এই ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের ডাকছেন তা, আমরা যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি তার চেয়ে উত্তম। অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য সাহায্য চাওয়ার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র প্রতি আমাদের প্রত্যাবর্তন শ্রেয়। কিন্তু সেই দলের সর্দার এক মুষ্টি কঙ্কর নিয়ে তার মুখে ছুঁড়ে মারে আর বলে, চুপ থাক, আমরা এ কাজের জন্য এখানে আসি নি। আর এ বিষয়টি তখন সেখানেই চাপা পড়ে যায়। কিন্তু লেখা আছে, আইয়াস যখন স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে আর মৃত্যুর সময় তার মুখ থেকে কলেমায়ে তওহীদ উচ্চরিত হচ্ছিল।

এর স্বল্পকাল পর, বুআসের যুদ্ধোত্তর ১১ নববীর রজব মাসে মক্কায় মদীনাবাসীদের সাথে মহানবী (সা.)-এর পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাদের বংশ পরিচয় জিজ্ঞেস করেন। জানা যায়, তারা খাযরাজ গোত্রের লোক এবং মদীনা থেকে এসেছে। পরম স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে মহানবী (সা.) তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, **"আপনারা কী আমার কিছু কথা শুনবেন?"** উত্তরে তারা বলে, **"হ্যাঁ, আপনি যা বলতে চান বলুন।"** তিনি (সা.) উপবেসন করেন এবং তাদেরকে ইসলামের তবলীগ করেন। আর পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত শুনিয়ে তাঁর দাবি সম্পর্কে অবহিত করেন। তখন তারা পরস্পরের প্রতি তাকায় এবং বলে এটিই সুবর্ণ সুযোগ, পাছে

কোথাও এমনটি যেন না হয়ে যায় যে, ইহুদীরা আমাদের পূর্বেই তাঁকে গ্রহণ করে বসে। এ কথা বলে তারা সবাই মুসলমান হয়ে যায়। তারা ছয়জন ছিলেন, যাদের নাম হল,

১. আবু উমামা আসাদ বিন যুরারাহ্, যার সম্পর্ক ছিল বনু নাজ্জারের সাথে, আর তিনি সর্বপ্রথম সত্যায়নকারী ছিলেন। ২. অওফ বিন হারেস, তার সম্পর্কও ছিল বনু নাজ্জারের সাথে। যা মহানবী (সা.)-এর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের নানার গোত্র ছিল। ৩. রা'ফে বিন মালেক, যিনি বনু যুরায়েকের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। তখন পর্যন্ত যতটুকু কুরআন শরীফ অবতীর্ণ হয়েছিল, এই সময় মহানবী (সা.) তা তাকে প্রদান করেন। ৪। কুতবাহ্ বিন আমের, যিনি বনু সালামাহ্র সাথে সম্পর্ক রাখতেন। ৫। উকবাহ্ বিন আমের, যিনি বনু হারামের সদস্য ছিলেন। (এই পুরো ঘটনায় তারই স্মৃতিচারণ হচ্ছে,) এই উকবাহ্ বিন আমের (রা.) বদরী সাহাবী ছিলেন। এবং ৬। জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ বিন রিয়াব, যিনি বনু উবায়েদের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন।

এরপর তারা মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করেন আর বিদায়ের প্রাক্কালে তারা নিবেদন করেন, গৃহযুদ্ধ আমাদেরকে অনেক দুর্বল করে দিয়েছে আর আমাদের পরস্পরের মাঝে অনেক অনৈক্য রয়েছে। আমরা মদীনায় গিয়ে আমাদের ভাইদের মাঝে ইসলাম প্রচার করব। অসম্ভব নয় যে, খোদা তা'লা আপনার মাধ্যমে আমাদেরকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করবেন। আমরা তখন সার্বিকভাবে আপনার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকব। অতএব তারা ফিরে যান আর তাদের কারণে মদীনায় ইসলামের চর্চা হতে থাকে।

মহানবী (সা.) মক্কায় এ বছরটি মদীনাবাসীদের পক্ষ থেকে বাহ্যিক উপকরণের নিরিখে আশা ও নিরাশার মাঝে অতিবাহিত করেন। তিনি (সা.) প্রায়শ ভাবতেন, দেখি এই (ঈমান আনয়নকারীদের) পরিণাম কী হয় আর মদীনায় সাফল্যের কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় কি-না। বাহ্যিক অবস্থার নিরিখে এ যুগটি মুসলমানদের জন্য আশা ও নৈরাশ্যের দোলায় দুলছিল। কখনো আশার কিরণ দেখা দিতো, কখনো নৈরাশ্য ছেয়ে যেতো। তাদের চোখের সামনে মক্কার সর্দারগণ আর তায়েফের নেতারা মহানবী (সা.)-এর দাবিকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। (আরবের) অন্যান্য গোত্রও একে একে সবাই এই অস্বীকারে নিজেদের মোহর অঙ্কিত করেছিল। মদীনায় আশার একটি ক্ষীণ আলো প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু কেউ হলফ করে বলতে পারতো না, এই কিরণ সমস্যা ও বিপদাপদের ঝঞ্ঝাবায়ু আর (বিরোধিতার) কঠিন তুফানের মাঝে প্রতিষ্ঠিত থাকতে সক্ষম হবে।

অপরদিকে মক্কাবাসীদের অন্যায়-অত্যাচার প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছিল আর তারা এ কথা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিল যে, ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার এটিই মোক্ষম সময়। কিন্তু এই স্পর্শকাতর সময়েও, যার চেয়ে বেশি বিপৎসংকুল সময় ইসলামের জন্য আর কখনো আসে নি, মহানবী (সা.) এবং তাঁর নিষ্ঠাবান সাহাবীরা এক দৃঢ় পাহাড়ের মতো নিজেদের জায়গায় অবিচল ও অনড় ছিলেন। আর তাঁর (সা.) এই দৃঢ় সংকল্প এবং অবিচলতা অনেক সময় তাঁর (সা.) বিরোধীদেরও হতভম্ব করে দিত যে, এই ব্যক্তি কত অসাধারণ মানসিক শক্তির অধিকারী! কোন কিছুই তাকে নিজ স্থান থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। বরং সেই যুগে মহানবী (সা.)-এর কথায় এক বিশেষ প্রতাপ ও পরাক্রম পরিলক্ষিত হতো। মহানবী (সা.) যখনই কথা বলতেন তাঁর (সা.) কথায় প্রবল প্রতাপ ও পরাক্রম প্রকাশ পেতো। আর সমস্যাবলীর এই প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ুতে তাঁর শির আরো উন্নততর হতো। এই দৃশ্য একদিকে

যেখানে মক্কার কুরাইশদের বিস্মিত করতো অপরদিকে কখনো কখনো তাদের হৃদয়কে প্রকম্পিতও করতো। এই দিনগুলো সম্পর্কে স্যার উইলিয়ম মূইরও লিখেছেন,

'সে দিনগুলোতে মুহাম্মদ (সা.) স্বজাতির সামনে এমন বীরত্বের সাথে দণ্ডায়মান থাকতেন যে, তার সামনে অনেক সময় তাদের টু শব্দটি করার জো থাকতো না। চূড়ান্ত পর্যায়ে নিজের বিজয় লাভের দৃঢ় বিশ্বাসে পরিপূর্ণ কিন্তু বাহ্যত নিরূপায়, নিঃসঙ্গ ও অসহায় তিনি এবং তাঁর ক্ষুদ্র জামা'তটি {অর্থাৎ মহানবী (সা.) এবং তাঁর ছোট্ট দলটি} যেন সে যুগে এক সিংহের কবলে ছিলেন। কিন্তু সেই খোদার সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে ছিল পূর্ণ বিশ্বাস, যিনি তাকে রসূল হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। উইলিয়াম মূইর লিখেন, মুহাম্মদ (সা.) এমন এক দৃঢ় সংকল্প নিয়ে নিজ জায়গায় দণ্ডায়মান ছিলেন যাকে কোন কিছুই স্বস্থান থেকে বিচ্যুত করতে পারতো না। এই দৃশ্য এমন এক মহান চিত্রের অবতারণা করে যার দৃষ্টান্ত ইসরাঈলের সেই অবস্থা ছাড়া অন্য কোথাও দেখা যায় না, অর্থাৎ যখন সে বিপদাপদ এবং দুঃখ-বেদনায় জর্জরিত অবস্থায় খোদার সামনে এই বাক্য বলেছিল, হে আমার মনীব! এখন তো আমি. হ্যাঁ একমাত্র আমিই নিঃসঙ্গ হয়ে গেলাম। পুনরায় তিনি লিখেন, না, বরং মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের এই চিত্র ইসরাঈলী নবীদের অবস্থার নিরিখেও এক দৃষ্টিকোণ থেকে মহান ছিল।... মুহাম্মদ (সা.)-এর এই বাক্য সেই সময় উচ্চারিত হয়েছিল (যখন তিনি বলেছিলেন), হে আমার জাতির নেতৃবৃন্দ! **তোমরা যা করতে পার কর, আমিও এক আশায় বুক বেঁধেছি।**

যাহোক, এটি ইসলামের জন্য চরম সংকটকাল ছিল। মক্কাবাসীদের পক্ষ থেকে পুরোপুরি নৈরাশ্য ছিল। কিন্তু মদীনায়, যারা বয়আত করে গিয়েছিল তাদের মাধ্যমে আশার কিরণ দেখা দিচ্ছিল। আর মহানবী (সা.)ও গভীর আগ্রহের সাথে সেই পানে চেয়ে ছিলেন যে, মদীনাও কি তাঁকে মক্কা এবং তায়েফের মতো প্রত্যাখ্যান করবে, নাকি তাদের অদৃষ্ট ভিন্নভাবে প্রকাশ পাবে। অতঃপর যখন হজ্জের মৌসুম আসে তখন তিনি (সা.) গভীর আগ্রহের সাথে নিজের বাড়ি থেকে বের হন আর মিনা অভিমুখে আকাবার কাছে পৌঁছে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করেন। তখন হঠাৎ করে তাঁর (সা.) দৃষ্টি মদীনার একটি ছোট্ট দলের ওপর পড়ে, যারা তাঁকে (সা.) দেখে সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারে এবং পরম ভালোবাসা ও নিষ্ঠার সাথে এগিয়ে এসে তাঁর (সা.) সাথে মিলিত হয়। এবার তারা ছিল বারোজন। যাদের পাঁচজন ছিল বিগত বছরের সত্যায়নকারী আর সাতজন নতুন। আর তারা অওস এবং খাযরাজ-উভয় গোত্রের সদস্য ছিল। তাদের নাম হল,

১. আবু উমামাহ্ আসাদ বিন যুরারাহ্, ২. অউফ বিন হারেস, ৩. রা'ফে বিন মালেক, ৪. কুতবাহ্ বিন আমের, ৫. উকবাহ্ বিন আমের, (উকবাহ্ বিন আমের এর স্মৃতিচারণ হচ্ছে, তিনি এবারও পুনরায় হজ্জের জন্য এসেছিলেন) ৬. মুআয বিন হারেস, তিনি বনু নাজ্জার গোত্রের সদস্য ছিলেন। ৭. যাকওয়ান বিন আবদে কায়েস, তিনি বনু যুরায়েক গোত্রের সদস্য ছিলেন। ৮. বনী বালী গোত্রের সদস্য আবু আব্দুর রহমান ইয়াযীদ বিন সা'লাবাহ্ ৯. বনী অওফ গোত্রের উবাদাহ্ বিন সামেত। পূর্বের জন খাযরাজ গোত্রের বনী বালীর সদস্য ছিলেন আর ইনি বনী অওফের সদস্য ছিলেন। ১০. বনী সালেমের সদস্য আব্বাস বিন উবাদাহ্ বিন নাযলাহ্। ১১. বনী আব্দিল আশহাল-এর সদস্য আবুল হায়সাম বিন তাইয়্যেহান এবং ১২. উয়ায়েম বিন সায়েদাহ্, তিনি অওস গোত্রের বনী আমর বিন অওফ শাখার সাথে সম্পর্ক রাখতেন।

মহানবী (সা.) মানুষের দৃষ্টির আড়ালে গিয়ে এক উপত্যকা বা ঘাঁটিতে এই ১২ জনের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তারা মদীনার খবরাখবর তাঁকে (সা.) অবহিত করেন আর এবার তারা সবাই রীতিমত তাঁর (সা.) হাতে বয়আত করেন। এই বয়আত মদীনায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার ভিত্তিপ্রস্তর ছিল, অর্থাৎ এর মাধ্যমে ইসলামের ভিত রচিত হয়। তখন পর্যন্ত যেহেতু তরবারীর জিহাদের নির্দেশ আসে নি তাই মহানবী (সা.) তাদের কাছ থেকে কেবল সেসব শর্তে বয়আত নিয়েছেন যেসব শর্তে জিহাদের নির্দেশ আসার পর মহিলাদের কাছ থেকে বয়আত নিতেন। অর্থাৎ, আমরা আল্লাহ্ তা'লাকে এক অদ্বিতীয় মানবো, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবো না, চুরি করবো না, ব্যভিচার করবো না, হত্যা করা থেকে বিরত থাকব, কারো প্রতি অপবাদ আরোপ করবো না, আর সকল পুণ্যকাজে আপনার আনুগত্য করব। বয়আতের পর মহানবী (সা.) বলেন, যদি তোমরা নিষ্ঠা ও অবিচলতার সাথে এই অঙ্গীকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক তাহলে জান্নাত লাভ করবে আর যদি তোমরা দুর্বলতা দেখাও তাহলে তোমাদের বিষয় আল্লাহ্ তা'লার হাতে, তিনি যেভাবে চাইবেন সেভাবে (ব্যবহার) করবেন। এই বয়আত ইতিহাসে আকাবাহ্'র প্রথম বয়আত হিসেবে প্রসিদ্ধ। কেননা যেই জায়গায় এই বয়আত নেয়া হয়েছিল সেই জায়গা আকাবাহ্ নামে পরিচিত যা মক্কা এবং মিনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। আকাবাহ্ শব্দের শাব্দিক অর্থ হল, উঁচু পাহাড়ী পথ বা উঁচু গিরিপথ।

মক্কা থেকে বিদায়ের প্রাক্কালে এই বারোজন নবমুসলিম আবেদন করেন, আমাদের সাথে কোন মুসলমান মুয়াল্লিম তথা শিক্ষক পাঠানো হোক যিনি আমাদের ইসলাম শেখাবেন আর আমাদের মুশরিক ভাইদের মাঝে ইসলাম প্রচার করবেন। তিনি (সা.) আব্দুদ দ্বার গোত্রের খুবই নিষ্ঠাবান এক যুবক মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-কে তাদের সাথে পাঠিয়ে দেন। মুসলমান মুবাল্লিগরা সে যুগে ক্বারী বা মুক্বরী নামে আখ্যায়িত হতেন কেননা, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাদের কাজ ছিল কুরআন শোনানো। কেননা, এটিই তবলীগের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম ছিল। এ কারণেই মুসআব যখন মদীনায় যান তখন মুক্বরী নামে পরিচিত হন। আকাবাহ্'র দ্বিতীয় বয়আত হয়েছিল ত্রয়োদশ নববীতে আর তখন সত্তরজন আনসারী সাহাবী বয়আত করেছিলেন।

{হযরত সাহেবযাদা মীর্যা বশীর আহমদ সাহেব, এম. এ. (রা.) রচিত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.), পৃ: ২২১ থেকে ২২৫ ও ২২৭}

হযরত উকবাহ্ বিন আমের (রা.) বদর, উহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। উহুদের দিন তিনি তার শিরোস্ত্রাণে সবুজ রঙের কাপড়ের মাধ্যমে সবার মাঝে স্বতন্ত্র ছিলেন। তিনি হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকালে দ্বাদশ হিজরীতে ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। {আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ৪২৮, উকবাহ্ বিন আমের (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত}

হযরত উকবাহ্ বিন আমের (রা.) বর্ণনা করেন আমি আমার পুত্রকে নিয়ে মহানবী (সা.) এর সমীপে উপস্থিত হই। তখনও সে স্বল্পবয়স্ক বালক ছিল। আমি নিবেদন করি, আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, আমার ছেলেকে দোয়া শিখান যেন সে এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করতে পারে, আর তার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করুন। তিনি (সা.) বলেন, হে বালক! বল, **'আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা সিহহাতান ফি ঈমানীন ওয়া ঈমানান ফি হুসনি খুলুকিন ওয়া সালাহান ইয়াতবাউহু নাজাহ্'**। {উসদুল গাবাহ, চতুর্থ খণ্ড, পৃ: ৫২, উকবাহ্ বিন আমের (রা.) বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকশিত]

অর্থাৎ, **"হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে ঈমানের অবস্থায় সুস্বাস্থ্যের দোয়া করি। আর ঈমানের সাথে উন্নত নৈতিক গুণাবলীর জন্য দোয়া করি। এমন কল্যাণের দোয়া করি যার পর আসবে সাফল্য।"** আল্লাহ্ তা'লা ক্রমাগতভাবে এই সাহাবীদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

এরপর এখন আমি আমেরিকা নিবাসী একজন অত্যন্ত প্রবীণ পুণ্যবতী আহমদী নারীর স্মৃতিচারণ করব আর জুমুআর পর তার গায়েবানা জানাযাও পড়াব। তার নাম হল, সিস্টার আলীয়া শহীদ সাহেবা। তিনি ছিলেন প্রয়াত আহমদ শহীদ সাহেবের স্ত্রী। গত ২৬ ডিসেম্বর তিনি ইন্তেকাল করেন, (إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)। আল্লাহ্ তা'লা তাকে দীর্ঘ জীবন দান করেছেন এবং কাজ করার সৌভাগ্য দিয়েছেন। পক্ষাঘাত বা অক্ষমতা থেকেও রক্ষা করেছেন। তার বয়স ছিল ১০৫ বছর। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পদমর্যাদা উন্নীত করুন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

আমেরিকার আমীর সাহেব তার সম্পর্কে লিখেছেন, তিনি ১৯৩৬ সনে বয়আতের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত লাজনা ইমাইল্লাহ্, আমেরিকার সদর হিসেবে সেবা করার তৌফিক পেয়েছেন। একইভাবে দীর্ঘ ৫০ বছর জুড়ে তিনি আমেরিকায় লাজনা ইমাইল্লাহ্র জেনারেল সেক্রেটারী, সেক্রেটারী মাল, সেক্রেটারী তালীম, সেক্রেটারী খিদমতে খালক এবং লাজনার স্থানীয় প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য পেয়েছেন। জামা'ত এবং খিলাফতের সাথে সর্বদা সুসম্পর্ক বজায় রেখেছেন। সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারের জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন। তিনি মানুষের প্রতি গভীর স্নেহ ও ভালোবাসা রাখতেন। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, আমেরিকার প্রাথমিক যুগের ঘটনাবলী তার কণ্ঠস্থ ছিল, যা তিনি প্রায়শঃ বলতেন। হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব (রা.)-কে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করার সুযোগও তিনি পেয়েছেন। তার স্বামী প্রয়াত জনাব আহমদ শহীদ সাহেব আমেরিকার ন্যাশনাল আমেলায় এবং স্থানীয় পিটসবার্গ জামা'ত-এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। মরহুমার শোকসন্তপ্ত পরিবারে রয়েছেন তার একমাত্র পুত্র ওমর শহীদ সাহেব, যিনি গত ১৮ বছর ধরে পিটসবার্গ জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করছেন। মরহুমা আফ্রো-আমেরিকান ছিলেন।

সিস্টার আলীয়া সম্পর্কে লাজনা ইমাইল্লাহ্, আমেরিকার সদর সাহেবা লিখেন, তার জীবনাচার, তার কথাবার্তা ও তার চলাফেরা সবই এ কথার স্বাক্ষর বহন করতো যে, তিনি ৭৬ বছর পূর্বে কৃত বয়আতের অঙ্গীকারের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তার সেবার গণ্ডি শুধু আমেরিকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তার সেবার কথা স্বীকার করার মানুষ সারা পৃথিবীতে রয়েছে। যখন সারা বিশ্বের লাজনা ইমাইল্লাহ্ পাকিস্তানের অধীনে ছিল, মহিলাদের অঙ্গসংগঠন অর্থাৎ বহির্বিশ্বের লাজনারাও পাকিস্তানের সদর লাজনার অধীনস্থ ছিল, তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)'র সহধর্মিণী হযরত মরীয়ম সিদ্দীকা সাহেবা সারা বিশ্বের লাজনার সদর ছিলেন। তার পক্ষ থেকেও মরহুমার কাজের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। তিনি লিখেন, সিস্টার আলীয়ার (পূর্বে) নাম ছিল ইলা লুইস। তার হবু স্বামী উইলিয়াম ফ্র্যাঙ্ক ব্রাউনিং আফ্রিকান মেথডিস্ট চার্চের খুবই সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তার বিয়ের সময় সন্নিকটে ছিল তাই তিনি তার বিয়ের প্রস্তুতির কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এ সময় তার স্বামীর কাছে আহমদীয়াতের বার্তা পৌঁছলে তিনি (উইলিয়াম সাহেব) তার পিতামাতাসহ আহমদীয়াত গ্রহণ করেন এবং নিজের নাম আহমদ শহীদ রাখেন। আলীয়া সাহেবা বিয়ে করলেও তখন বয়আত করেন নি। স্বল্পকাল পর আহমদ শহীদ সাহেব পিটসবার্গ জামা'তের প্রেসিডেন্ট

নির্বাচিত হন। তিনি শুধু জামা'তী গণ্ডিতেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেন নি বরং সারা দেশে তবলীগি কার্যক্রমের কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সে সময় তাদের পরিবারের এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে যার নাম রাখেন তারা ওমর।

আলীয়া সাহেবা তার আহমদী শ্বশুর বাড়িতেই থাকতেন। সেখানে তিনি স্বামী এবং শ্বশুর বাড়ির লোকদের অগোচরে জামা'তের বই-পুস্তক পড়তে আরম্ভ করেন। সে যুগে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর পুস্তক **'আহমদীয়াত ইয়ানী হাকীকি ইসলাম'** তার হাতে পৌঁছে, এটি পাঠ করে তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হন। এরপর নিজ বাড়িতে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন তরবীয়তি ক্লাসেও তিনি অংশগ্রহণ করতে আরম্ভ করেন। আব্দুর রহমান বাঙালী সাহেব সেখানে মুবাল্লিগ ছিলেন। একদিন তিনি তার বক্তৃতা শুনেন, যাতে তিনি ঈসা (আ.)-এর ক্রুশীয় মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ এবং কাশ্মীর অভিমুখে তাঁর হিজরত সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিশ্বাস বর্ণনা ধরেন। লাজনার সদর সাহেবা লিখেন, তিনি বলতেন- এরপর আমি গির্জায় যাওয়া বন্ধ করে দেই এবং মসজিদে যেতে আরম্ভ করি, আর অবশেষে ১৯৩৬ সনে আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করি। তিনি নিজের নাম আলীয়া কিভাবে রাখলেন সে সম্পর্কে বলেন, একটি বইয়ে আলীয়া নামটি পড়ে আমার ভালো লাগে আর আহমদী হওয়ার পর আমি সেই নামটি গ্রহণ করি।

সিস্টার আলীয়া সবসময় জ্ঞানান্বেষণে রত থাকতেন। সবসময় মসজিদ পরিষ্কার করতেন, খাবার রান্না করতেন, নামায পড়তেন। অর্থাৎ শুধু জ্ঞানই অর্জন করতেন না, বরং বিনয়ের সাথে ওয়াকারে আমলও করতেন আর নিজ হাতে জামা'তী কাজকর্মও করতেন, যেমন- মসজিদ পরিষ্কার করা, খাবার রান্না করা ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি আরো বলেন, আমরা প্রায়শ তাকে নামায পড়তে দেখেছি। উন্নত চরিত্রের আলোচনা আর অসুস্থদের সেবা-শুশ্রূষা করতে দেখেছি। নিয়মিত চাঁদা দিতে দেখেছি। লাজনাদের বা মহিলাদের সবসময় কোন না কোন পুণ্যের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি লিখেন, মহিলাদের পারস্পরিক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠার প্রতিই তার পুরো মনোযোগ নিবদ্ধ থাকতো, এজন্য জীবনশায়াহ্নে তিনি লাজনাকে সম্বোধন করে বেশ কিছু চিঠিপত্র লিখেছেন। লাজনার সদর লিখেন, তিনি একটি আয়াত প্রায় সময় পুনরাবৃত্তি করতেন যা আমি তার কাছে শুনেছি। আর তা হলো-

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ (সূরা আস্ সাফ: ৫)

তিনি বলেন, সবসময় এটি পড়তে থাকতেন। অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা সেসব লোককে ভালোবাসেন যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে জিহাদ করে, যেন তারা সীসা-গলিত প্রাচীর।

লাজনার সদর লিখেছেন, তিনি সর্বপ্রথম আমেরিকায় মসজিদ তহবিলের সূচনা করেন। একইভাবে মুসলিম স্টুডেন্টস স্কলারশীপ ফান্ডের (শিক্ষাবৃত্তি তহবিল) প্রবর্তণ করেন। তার নেতৃত্বে সর্বপ্রথম লাজনা ইমাইল্লাহ্র বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। একইভাবে জাতীয় তবলীগ দিবসের সূচনাও তিনিই করেন, যাতে মহিলারা পবিত্র কুরআনের সহস্র সহস্র কপি, তবলীগি লিফলেট, পরিচিতিমূলক হস্তবিল ইত্যাদি দেশের বিভিন্ন লাইব্রেরীতে পাঠাতেন। তিনি লাজনা ইমাইল্লাহ্র একটি পত্রিকাও প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন, যার নাম লাজনার কেন্দ্রীয় সদর হযরত ছোটি আপা মরীয়ম সিদ্দীকা সাহেবা **'আয়েশা'** রেখেছিলেন। অর্থাৎ তার দ্বারা নামকরণ করিয়েছেন। তিনি The path of faith এবং Our Duties নামে লাজনা ইমাইল্লাহ্র 'লায়েহায়ে আমল' বা কর্মপন্থা প্রকাশ করেন। তার আহ্বানে

আমেরিকার লাজনা ইমাইল্লাহ্ ডেনমার্কে নির্মিত মসজিদের জন্য উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে আর্থিক কুরবানী করেছে। একইভাবে বাল্টিমোর এবং পিটসবার্গ ইত্যাদি স্থানের মিশন হাউসকে সজ্জিত করার জন্য তহবিল সরবরাহ করেছে। তিনি বলেন, সিস্টার আলীয়া বলতেন, যেহেতু সে যুগের শতকরা ৯৮ ভাগ মহিলা বয়আত করে জামা'তভুক্ত হয়েছিলেন তাই প্রথম দিকে আমরা তাদেরকে কেবল নামায পড়ার এবং রমযান মাসে রোযা রাখার জন্য অনুপ্রাণিত করতাম। একইভাবে শুরুতে পর্দার করার পরিবর্তে প্রথম কয়েক বছর শুধু যথাযথ পোশাক পরিধান করার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতাম। অর্থাৎ প্রথমে নিজেদের পোশাক শালীন কর, এরপর আসবে পরবর্তী পদক্ষেপ অর্থাৎ হিজাব পড়, পর্দা কর। এমনটি নয় যে, অধুনাকালের লাজনাদের বা মহিলাদের মতো হবে অর্থাৎ যারা পর্দা করতো তারাও পর্দা ছেড়ে দিয়েছে। তিনি লাজনাদের তরবীয়তের ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে প্রথম স্তর থেকে দ্বিতীয় স্তরে উন্নীত করার চেষ্টা করেছেন।

এরপর সিস্টার আলীয়া লাজনা সদস্যাদের কুরআন শেখানোর জন্য অনেক চেষ্টা করেন। দৈনিক কুরআন নাযেরা পড়ানোর পরিকল্পনা হাতে নেন। একইভাবে যেসব লাজনা কুরআন নাযেরা পড়া শেষ করতেন তাদেরকে প্রতিদিন তফসীরের কিছু অংশ পড়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হতো। আলীয়া সাহেবার প্রচেষ্টায় নাসেরাতেরও পাঠ্যসূচী প্রণীত হয়। নাসেরাতদের মাঝে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের আগ্রহ জন্মে। মরহুমা (জামা'তের) সদস্যাদের মাঝে ত্যাগের প্রেরণা সঞ্চারের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। অনুরূপভাবে চাঁদার হিসাবও অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সংরক্ষণ করতেন।

জামা'তভুক্ত হলে যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সে সম্পর্কে একবার তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি জামা'তভুক্ত হওয়ার পর অনেক পরীক্ষা দেখেছি, কিন্তু দুর্বলতা দেখানোর পরিবর্তে আমি সর্বদা অবিচলতা প্রদর্শন এবং খোদার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করেছি। আর এই পাঠই আমি গত পঞ্চাশ বছরের অধিককাল যাবৎ লাজনাদের দিয়ে আসছি। তিনি লিখেন, তার ব্যক্তিত্ব অবিচলতার এক মূর্ত প্রতীক ছিল যার কাছ থেকে আমরা সবাই পথের দিশা পেতাম। তিনি আরো লিখেন, ইসলাম সারা বিশ্বে জয়যুক্ত হবে– এ সম্পর্কে তার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। তিনি বলতেন, যখন ইসলামের বিজয় আসবে তখন আহমদীয়া জামা'তের ব্রত **'ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'**– এটি সারা পৃথিবীতে রাজত্ব করবে। একইভাবে খিলাফত ব্যবস্থার প্রতিও তার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল আর একেই তিনি ইসলামের বিজয়ের চাবিকাঠি আখ্যায়িত করতেন। তিনি সব সময় বলতেন, খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকবে আর এর মাধ্যমেই ইসলামের বিজয় আসবে, ইনশাআল্লাহ্। পুনরায় তিনি লিখেন, শত শত ফোনকল এবং চিঠির মাধ্যমে সদস্যদের মাঝে তিনি এই বাণী পৌঁছানোর ও বুঝানোর চেষ্টা করতেন।

২০০৮ সনের ২৩ মার্চ মসীহ্ মওউদ দিবস উপলক্ষ্যে লাজনার উদ্দেশ্যে তিনি যে বার্তা দিয়েছেন তা হল, এ বছর পহেলা জানুয়ারি, ২০০৮ তারিখে সারা বিশ্বে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনুসারীরা নিজেদের মসজিদ ও মিশন হাউসে সমবেত হয়েছে এবং কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ করতে গিয়ে তাহাজ্জুদের নামায পড়েছে আর কেনই বা আমরা এমনটি করবো না, কেননা এটিই তো সেই বছর যাতে আমাদের প্রাণপ্রিয় মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রিয় খিলাফত প্রতিষ্ঠার শত বছর পূর্ণ হয়েছে। তিনি আরো লিখেন, হে আল্লাহ্! আহমদীয়াতের পথে বিরাজমান সকল প্রতিবন্ধকতা তুমি দূর কর এবং আমাদেরকে সেই

বিজয় দেখাও যার প্রতিশ্রুত তুমি দিয়েছ। আমাদের হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই জামা'তের ভিত্তি স্থাপন করেছেন আর আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে এক দেহ (সদৃশ) বানিয়ে দিয়েছেন। এ কারণেই আমরা আহমদীরা পরস্পরের বেদনা অনুভব করি। পরীক্ষার সময় একে অন্যের সাথে থাকি। পরস্পরের জন্য দোয়া করি। একের আনন্দে অন্যজন আনন্দিত হই। একের দুঃখে অন্যজন দুঃখভারাক্রান্ত হই। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমরা এক প্রাণ। নবাগত আহমদী এবং সেখানকার সকল আহমদী লাজনার উদ্দেশ্যে তিনি যে বার্তা দিয়েছেন তাতে তিনি লিখেছেন, আমার প্রতি খোদার বিশেষ কৃপা আর আমি সৌভাগ্যবতী যে, আমি আমার জীবদ্দশায় জামা'তের উন্নতি দেখেছি। আমাদের প্রতি খোদার অনুগ্রহ, কেননা তিনি আমাদের জামা'তকে ইসলাম প্রচার এবং ইসলামের সেবার জন্য মনোনীত করেছেন। আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে যুগ-খলীফার আওয়াজ শুনতে পারি, তাঁর নির্দেশাবলীর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে ইহ ও পরকালে উন্নতি করতে পারি। এরপর শেষের দিকে তিনি লিখেন, আমি দোয়া করি, হে আমার প্রভু! ইসলামের বিজয়ের পথে বিরাজমান সকল প্রতিবন্ধকতা তুমি দূর করে দাও। আমাদের সত্তাকে তুমি ধর্মের সত্যিকার প্রতিবিম্ব বানিয়ে দাও এবং আমাদেরকে ধর্মের অগণিত সাহায্যকারী দান কর। অতএব, এভাবে তিনি সেখানে লাজনাকে, বিশেষ করে আমেরিকাতে বিরাজমান অবস্থানুসারে নবাগতা আহমদী নারী এবং আফ্রো-আমেরিকানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে তার মূল্যবান ভূমিকা রয়েছে।

তার পুত্র পিটসবার্গ জামা'তের প্রেসিডেন্ট ওমর শহীদ সাহেব লিখেন, আমার পিতামাতা আহমদীয়াত এবং খিলাফতের মাধ্যমে ইসলামের প্রতিরক্ষাকল্পে সৈনিকের মতো ছিলেন। তিনি আমাকে লিখেন, আমার মা সবসময় আপনাকে পত্র লিখতেন আর সবসময় আমার মনোযোগও এদিকে আকর্ষণ করতেন যে, সর্বদা যুগ-খলীফার নিকট পত্র লিখবে। তিনি আরো লিখেন, দোয়া করুন আমি এবং আমার সন্তানসন্ততিরাও যেন প্রয়াতের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারি। তিনি লিখেন, জামা'তের সদস্যরা এত ব্যাপকভাবে আমার মায়ের জন্য নিজেদের আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করেছে যে, এ সম্পর্কে পূর্বে আমার কোন ধারণাই ছিল না যে, জামা'তে তার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পোষণকারী মানুষের সংখ্যা কত বেশি!

সেখানকার আরো একজন স্থানীয় আমেরিকান আহমদী হলেন, সিস্টার আলীয়া আযীয লর্ড সাহেবা। তিনি বলেন, ইসলাম আহমদীয়াত গ্রহণের পর তিনি অর্থাৎ আলীয়া শহীদ একজন আহমদী হিসেবে একটি আদর্শ জীবন যাপন করেছেন। তিনি যখন সেক্রেটারী তা'লীম ছিলেন তখন তার কারণেই তার প্রণীত তা'লীমী পরীক্ষায় ফেল করা কেউ পছন্দ করত না। এ কারণে আমরা সবাই একত্রে তা'লীমী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতাম। তিনি বলেন, তিনি বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড় ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার সাথে গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তিনি বলেন, একটি বিষয় আমি তার মাঝে দেখেছি, তাকে কোন শিক্ষামূলক প্রশ্ন করা হলে তিনি নিজের মতামত ব্যক্ত করার পরিবর্তে, অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার পরিবর্তে অথবা, মনগড়া কথা বলার পরিবর্তে সবসময় সে সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা তুলে ধরতেন। খোদার সাথে তার নিবিড় সম্পর্ক ছিল। এ কারণে মানুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হতো।

এরপর রয়েছেন হামেদ মুনীর সাহেবের স্ত্রী সিস্টার জামিলা হামেদ। তিনিও একজন স্থানীয় আমেরিকান আহমদী। তিনি লিখেন, মরহুমা আমাকে খুবই ভালোবাসতেন এবং তিনি আমাকে সব সময় বলতেন, তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে। তিনি বলেন, আমার মায়ের ইন্তেকালের পর আমাকে ভালোবাসাপূর্ণ পত্র লিখেন, যার কল্যাণে মৃত্যুর দর্শন বুঝা আমার

জন্য সহজ হয়েছে। ফিরিশ্‌তাতুল্য মানুষ ছিলেন। যখনই সাহায্য এবং পরামর্শের প্রয়োজন হতো তাকে মাত্র একটি ফোন কলের দূরত্বেই পেয়েছি। সবসময় আমাকে বলতেন জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, জামা'তের সেবা করা এবং যুগ-খলীফাকে ভালোবাসা, কেননা এ যুগে তিনিই আল্লাহ্‌র রজ্জু। তার দৃঢ় বিশ্বাস এবং খোদার প্রতি ভালোবাসাকে আমি সর্বদা ঈর্ষার চোখে দেখতাম। একবার আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, তার কি মৃত্যুর ভয় হয়? তিনি বলেন, প্রেমাস্পদের কাছেই তো যেতে হবে, তাই ভয় কিসের! তিনি ইসলাম এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণীর গভীর জ্ঞান রাখতেন, যা তিনি আজীবন মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

আরেকজন স্থানীয় আমেরিকান আহমদী হলেন, ডাক্তার রশীদা আহমদ সাহেবা। তিনি বলেন, মরহুমা নিজে ইসলামী শিক্ষা কঠোরভাবে মেনে চলতেন, কিন্তু অন্যদেরকে খুবই স্নেহের সাথে উপদেশ দিতেন। তার প্রতিটি গতিবিধিতে খোদাপ্রেম প্রকাশ পেতো। তিনি বলেন, একাধিকবার তার বাড়িতে আমার থাকার সুযোগ হয়েছে। আমরা একসাথে নামায পড়তাম, পবিত্র কুরআন পাঠ করতাম। এরপর তিনি আমাকে খলীফাদের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত চিঠিপত্র পরম ভালোবাসা ও আগ্রহের সাথে দেখাতেন। তার কবিতা এবং বক্তৃতা শুনে সহজেই খিলাফতের সাথে তার ভালোবাসার গভীরতা অনুমান করা যায়। তিনি বলেন, তিনি কবিতাও লিখতেন। পরম ধৈর্যশীলা ছিলেন। প্রত্যেক মাসে ফোন করে তার খবরাখবর নিতেন। তার ভগ্ন স্বাস্থ্য সম্পর্কে কখনো অভিযোগ করেন নি। বরং সবসময় খোদা তা'লার অনুগ্রহরাজি স্মরণ করতেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন।

একইভাবে একজন স্থানীয় আমেরিকান আহমদী হলেন, আলহাজ্জ রশীদ সাহেবের স্ত্রী সিস্টার আযীযা। তিনি বলেন, সিস্টার আলীয়া শহীদ সাহেবা **'ভালোবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে'**- এর মূর্ত প্রতীক ছিলেন। যদিও তিনি অন্য শহরে থাকতেন তবুও আমার মায়ের সাথে তার খুব ভালো বন্ধুত্ব ছিল। আমার মায়ের ইন্তেকালের পরও এই সম্পর্ক তিনি ছিন্ন করেন নি। বরং সবসময় আমার এমন মনে হতো যে, আমি কখন অলস হই তা হয়তো বা আলীয়া সাহেবা জানেন আর তাৎক্ষণিকভাবে ঈমান উদ্দীপক পত্র পাঠিয়ে দিতেন।

আরো একজন মহিলা খিল্লত সাহেবা লিখেন, ১৯৪৯ সনে যখন আমি প্রথমবার আমেরিকায় আসি তখন আলীয়া সাহেবার সাথে পরিচয় হয়। যখন আমার সাথে তার প্রথমবার সাক্ষাৎ হয় তখন আমার বয়স ছিল মাত্র ৮ বছর। তিনি খুবই স্নেহশীলা, মিশুক এবং প্রভাববিস্তারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। খিলাফতের সাথে তার দীর্ঘদিনের ও সুদৃঢ় সম্পর্ক ছিল। প্রায়শ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র সাথে তার চিঠিপত্র আদানপ্রদানের কথা উল্লেখ করতেন। লাজনা ইমাইল্লাহ্ আমেরিকার জন্য তার সেবা অবিস্মরণীয়। বিস্ময়কর এক আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। শতবর্ষী হওয়া হওয়া সত্ত্বেও জলসায় যোগদান করতেন, যা আমাদের সবার জন্য একটি অনুকরণীয় আদর্শ।

আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তার মাঝে ধর্ম সেবার যে প্রেরণা এবং চেতনা ছিল তা পরবর্তী প্রজন্মের মাঝেও সঞ্চার করুন, যেমনটি তার পুত্রও আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন।

(আল্ ফযল ইন্টান্যাশনাল, ০১-০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯, পৃঃ ৫-৯)
(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)